# নীলফামারী জেলা

## শুনলেও কেউ বিশ্বাস করেনি

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে দেশে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। দেশের মানুষের অবস্থা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একদিন আমার বাবা বাজারে গিয়েছিলেন। সেদিন সকাল সকাল বাজার থেকে ফিরে আমাদের সবাইকে ডেকে বলেন যে, পাকসেনাদের গাড়ি আমাদের বাড়ির এদিকে আসবে। কথাগুলো সবাই শুনলেও কেউ তা বিশ্বাস করেনি। আমার বয়স তখন আনুমানিক ১৬ কি ১৭ হবে। ১৩-১৪ দিন পর শোনা গেল সব জায়গায় পাকিস্তানি সৈন্য এসে গেছে। তখন কিন্তু আমাদের এ দিকের কোনো রাস্তা পাকা ছিল না। আমার দাদাসহ আমাদের গ্রামের কয়েকজন ও পাশের গ্রামের কয়েকজন লোক মিলে রাস্তায় বড় বড় শিমুল গাছ, কলা গাছ আর অন্যান্য গাছ বিছিয়ে দেয়, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না। আমাদের বাড়ির উত্তর পাশে পরের দিন এক মাইল দূর থেকে মানুষের চিৎকার শোনা যায়। তারা অনেক মানুষের বাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেয়। চারদিকে মানুষের শোরগোল ওঠে। সবাই নিজের যা কিছু আছে তা পোটলা বেঁধে নেয়। যার যা ছিল তা হাতে নিয়ে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যায় ভারতের দিকে।

আমার মা-বাবা, দাদা, কাকা-কাকি ও এক কাকার ছেলেসহ আমিও কাঁধে পোটলা নিয়ে যাই। দাদা আমাদের গরুগুলো নিয়ে যায়। বাবা একটা চটের ব্যাগের মধ্যে কাপড়-চোপড় আর মাথায় এক বোঝা খড়ি নেয়। কাকা মনে হয় একটা ট্রাঙ্ক নিয়েছিল। কিন্তু আমার কাকি কিছু নিতে পারেনি। কারণ কাকির ছেলে বিকাশ কিছুতেই হাঁটতে পারেনি। তাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয়েছিল। তখন ছিল দুপুর। সবাই মিলে দলে দলে চলেছি। ডিমলার নদী পার হতে না হতেই আঁধার নেমে এলো। সবার সাথে ছেলেমেয়ে। কেউ দুই দিনের বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে। কোনোমতে আমরা পার হয়ে ডিমলার উত্তরে ডাঙ্গার স্কুলে গিয়ে রাত কাটাই। সেই সময় কেউ খেতে পেরেছে, কেউ পায়নি। আমার দাদা-দাদি ও মা খায়নি। আমি, কাকা-কাকি ও বিকাশ কিছু চিড়ামুড়ি খেয়ে রাত কাটাই। পরের দিন ভোর না হওয়ার আগে আবার সবাই হাঁটতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে বিকাল বেলা ভারতে পৌঁছে যাই। ৩-৪ দিন শুধু চিড়া-মুড়ি খেতে হয়েছিল আমাদের। তারপর ভারতের সরকার আমাদের থাকার জন্য তাঁবু তৈরি করে। খাওয়ার জন্য গম, আলু, চাল, ডালসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য দেয়। কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এভাবে ৯ মাস অনাহারে, অর্ধাহারে ও রোগে ভোগার পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তখন বাংলাদেশের সরকার বাস-ট্রাক দিয়ে আমাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ফিরে এসে আমরা কোনো জিনিস খুঁজে পাইনি।

সূত্র: জ-৪৪২২

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **সর্বেশ্বর রায়** | **শান্তি বালা** |
| চিড়াভিজা গোলনা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | বয়স : ৫১, সম্পর্ক : মা |
| ৯ম শ্রেণি, রোল : ০৭, বয়স : ১৪ | |

## চিলহাটি মুক্ত হলো

আমাদের স্কুলে সেনা ছাউনি হয়েছিল। স্কুল বসত বর্তমান জনতা ব্যাংকের একটি গুদামে। স্কুল চলছিল এলোমেলো অগোছালো। ৫০০ ছাত্রের মধ্যে উপস্থিত হতো ৩০-৩৫ জন। সেদিন ছিল শনিবার। স্কুলের দ্বিতীয় ঘণ্টায় দশম শ্রেণিতে বাংলা পড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দরজায় প্রধান শিক্ষক এবং তার সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এক হাবিলদারকে দেখে পড়ানো বন্ধ করলাম। প্রধান শিক্ষক আমাকে বললেন, 'স্যার অফিসে আসুন'। আমি গেলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম আর্মির বড় অফিসার আমাকে ডাকবাংলোয় যেতে বলেছে। হাবিলদারের সাথে চললাম। তিন মিনিটের পথ। ডাকবাংলোর উঁচু বারান্দায় গোল করে বসা সেনাবাহিনীর তিন অফিসার এবং আমার চেনা পিস কমিটির কয়েকজন সদস্য।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর হুকুম হলো আমাকে গুলি করে হত্যা করার। পিস কমিটির সদস্যরা মুখ খুললেন না। শুধু পায়জামা বাদে আর সব পোশাক খুলতে বলা হলো। আমি খুললাম। পাঞ্জাবি, গেঞ্জি, ঘড়ি, আংটি, কলম সবই কাপড়ের একটা পুটলি বেঁধে এক চৌকিদারের হাতে দেওয়া হলো আমার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আমার কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ডাকবাংলোর উত্তরে জংলি গর্তটার কাছে। সেখানে পৌঁছে

গেছি, হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকল। আমাকে আবার দড়ি টেনে টেনে বারান্দায় ফিরিয়ে আনা হলো। কী কথাবার্তা তাদের মধ্যে হয়েছিল জানি না। শুধু বুঝলাম আমাকে এখন নিয়ে যাওয়া হবে। আমার চোখ কালো কাপড়ে বেঁধে হাতকড়া পরিয়ে দুজন সৈন্য আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল হেড মাস্টারের রুমটাতে। যেখানে অনেক ভারী ভারী অস্ত্র থরে থরে সাজানো ছিল। বড় একটা শিকলে হাত বেঁধে একটা রকেট লাঞ্চারের সাথে বেঁধে রাখল আমাকে।

সেখানেই আমাকে কাটাতে হয়েছিল সাত দিন সাত রাত। প্রতি রাতে আমার ওপর চলত অমানুষিক নির্যাতন। চড়-থাপ্পড়, ঘুষি, সিগারেটের আগুনের ছ্যাঁকা, বুট পায়ে গলা চেপে ধরা আরও কত কী? এক রাতে অন্য এক ঘরে তিনটা কাটা লাশ দেখিয়ে ছিল ওরা আমাকে। আর একদিন দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে দেখেছিলাম এক পাকাচুলওয়ালা লোককে গুলি করে হত্যা করত। এভাবে পুরো সপ্তাহ কেটে গেল। শুক্রবার সকাল ১০টায় আমাকে আবার চোখ বেঁধে টেনে এনে দরবারে দাঁড় করিয়ে চোখ খুলে দেয়া হলো। পিস কমিটির কয়েকজন সদস্য আমার শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন দেখে চোখে হাত বুলিয়েছিল। আমার প্রতি নির্দেশ হলো আমাকে ডাকবাংলোর ৫০০ গজ চৌহদ্দির মধ্যে থাকতে হবে এবং স্কুলে নিয়মিত ক্লাস নিতে হবে। তাই করেছিলাম। মনোয়ার হোসেন (মনো মিয়া) আমাকে তার বাড়িতে জায়গা দিয়েছিলেন। আর যদি আমি পালিয়ে যাই তাহলে ৫০ হাজার টাকা সেনা কমান্ডারকে দিতে হবে– এ জামিন নিয়েছিলেন স্থানীয় আরেক এক ব্যবসায়ী হরুনার রশিদ প্রধান (হারু মিয়া)।

৪ ডিসেম্বর রাতে চিলাহাটী দুদিক থেকে এক সাথে আক্রান্ত হবার খবর পেয়ে সেই বিকেলেই এক বন্ধুসহ পালিয়ে চলে গেলাম মুক্ত এলাকা কাজলদিঘীতে। সারা সন্ধ্যাজুড়ে ডজনখানেক ট্রাকে করে পাকিস্তানি সেনারা পিছিয়ে গেয়েছিল ডোমার পর্যন্ত। ওই রাতেই মুক্তিবাহিনী চিলাহাটী ঢুকে পড়ে আর তার সাথে সাথে ভারতীয় সেনা সদস্যরাও।

চিলাহাটী মুক্ত হলো, মুক্তি পেলাম আমিও। আমি অবশ্য পরের দিনেই চিলাহাটী ফিরে এসেছিলাম।

সূত্র: জ-৪৩২৯

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **মো. নূর শবুর আলম** | **আবদুল কাদের আহমেদ** (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক) |
| চিলাহাটি মার্চেন্টস উচ্চ বিদ্যালয় | চিলাহাটি মার্চেন্টস উচ্চ বিদ্যালয় |
| দশম শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ, রোল : ২ | ডাক : চিলাহাটি, জেলা : নীলফামারী |

## দিনভর দেশের কথা মনে পড়ে

২৬ মার্চের পর খানসেনাদের অত্যাচারে অনেক লোক ভারতে চলে যায়। তখন পর্যন্ত আমাদের ওপর খানসেনাদের কোনো প্রকার চাপ পড়েনি। তবু শহর এলাকার লোকদের ভারত যাওয়া দেখে, আমি আমার প্রতিবেশী মুকুন্দ মোহন মহন্ত, কামাক্ষা চরণসহ ভারতে যাই। আমরা গোঁসানীমারী, কুচবিহার, দিনহাটা ও জলপাইগুড়ি জেলার অনেক জায়গায় ঘোরাফেরা করে দেখতে পাই। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর জেলার লোক শরণার্থী হিসাবে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও হাটবাজারে অবস্থান করছে। তাদের কাছে জানতে পারি খানসেনাকর্তৃক নির্যাতিত হয়ে অনেকে মা-বাবা, ভাই-বোন ও সন্তান সন্ততি হারিয়ে প্রাণে বাঁচার তাগিদে ভারতে চলে আসে। এসব দৃশ্য দেখে মনের অবস্থা খারাপ হয়। আমরাও বাড়ি ফিরে পরিবার-পরিজন নিয়ে ভারতে চলে আসব বলে মনস্থির করি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমরা দেশে ফিরে আসি। গ্রামের কিছু লোককে ডেকে দেশের অবস্থার কথা জানিয়ে দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিই। আমরা অর্থ সংগ্রহের জন্য গোপনে গরু-বাছুর, ধান-পাট বিক্রির সংকল্প নিই। পার্শ্ববর্তী খারাপ প্রকৃতির তৎকালীন মুসলিম লীগের লোকেরা আমাদের গতিবিধি লক্ষ করে। হঠাৎ একদিন সকাল

১০টার দিকে হাজার হাজার লোক আমাদের পল্লীতে ঢোকে এবং স্থাবর-অস্থাবর ধন-সম্পদ গরু-বাছুর, ঘরবাড়ি তছনছ করে সব কিছু লুট করে নিয়ে যায়। আমি তখন পরিবার-পরিজন নিয়ে আমার প্রতিবেশী নওশের আলী মিয়ার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করি। তিনি আওয়ামী লীগ নেতা। দেশ স্বাধীনে তার অবদান ছিল। সেখানে আমি আমার পরিবার-পরিজনকে নিয়ে একদিন অবস্থান করি। পরের দিন গ্রামের সব লোক ভারতের দিকে রওনা হই। গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের দলিরাম মৌজার শরীফাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকলে একত্রিত হয়ে রাত কাটাই। পরের দিন গরুর গাড়িতে মালামাল নিয়ে নারী-পুরুষ হেঁটে তিস্তা নদীর ডারকা ডোবার ঘাটে তিনটার দিকে উপস্থিত হই। নৌকাযোগে নদী পার হয়ে অনতিদূরে কালীগঞ্জ এলাকার একটি ছোট হাটে অবস্থান করি। পরের দিন দই খাওয়া বর্ডার হয়ে ভারতে প্রবেশ করি। বড় মরিচার পাশে একটি ক্যাম্পে অবস্থান করি। সেখান থেকে আমি দক্ষিণা মেম্বার ও মুকুন্দ মহন্তসহ গোঁসানীমারী যাই। আমার এক আত্মীয় ডা. যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তার পরামর্শ মোতাবেক আমরা পরের দিন গোঁসানীমারী চলে যাই। ডা. বাবুর সহায়তায় মাড়োয়ারীদের গোডাউনে আশ্রয় পাই। ওখানকার রাজনীতিবিদগণ আমাদের খবরাখবর নেন। পরে দিনহাটা শরণার্থী ক্যাম্পের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের জন্য আটা বরাদ্দ করেন। কিছু দিনের মধ্যে স্কুল মাঠে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেন এবং পরিবার প্রতি রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করেন। অতি কষ্টে জীবন বাঁচানোর তাগিদে কালক্ষয় করতে থাকি।

এমন সময় মুক্তিবাহিনীতে লোক নিয়োগ হচ্ছে শুনে আমি নিজে গ্রামের ১০-১২ জন যুবক ছেলেকে ইয়ুথ ক্যাম্প দিনহাটায় নিয়ে যাই। আমার শারীরিক ফিটনেস না থাকায় আমাকে ফেরত দেয়া হয়। পরে আমি ক্যাম্পে চলে আসি।

এবার নয় মাস যাবৎ ক্যাম্পে অবস্থান করি। ভারত সরকারের সহায়তায় অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান পাই। দিনভর দেশের কথা মনে পড়ে এবং চোখের জল ফেলি। অনেক দিন অনেক আত্মীয় স্বজনের দুঃসংবাদ পেয়ে ব্যাকুল হয়ে যাই। মন চায় কবে জন্মভূমিতে ফিরে যাব।

অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর পেয়ে মনের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। আমরা মুক্ত হবো। আমার দেশ স্বাধীন হবে। আমরা দেশে ফিরে যাব। এ আশা সদাসর্বদা মনে জাগে।

একদিন আমি দিনহাটা ক্যাম্পে যাই। সেখানে দেখতে পাই, ভুরুঙ্গামারীতে খানসেনাদের সাথে যুদ্ধ চলছে। দিনহাটা থেকে পদাতিক বাহিনীর হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য গোলাবারুদ বোঝাই ট্রাক, মেশিনগান ভুরুঙ্গামারীর দিকে যাচ্ছে। তা দেখে আমার মনে হয় অচিরেই আমাদের দেশ খানসেনামুক্ত হবে। তারই কয়েক মাস পরে আমরা সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়ে গেলাম।

আমরা ক্যাম্পে থাকাকালীন সেখানে একটি ক্যাম্প কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। কুড়িগ্রাম নিবাসী সিন্দুরমতি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ত্রৈলক্যচন্দ্র রায় কমিটির সভাপতি এবং আমি সম্পাদক পদে নিয়োজিত হই। ফলে ৪-৫ হাজার শরণার্থী আমাকে চিনত। আমি সার্বক্ষণিক সকলের অভাব-অভিযোগ শুনতাম ও তা পূরণে চেষ্টা করতাম। মাঝে মাঝে দিনহাটা হতে শরণার্থী শিবির দেখাশোনার কর্মকর্তাগণ এসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতেন।

১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪টার দিকে আমরা জানতে পারলাম, খানসেনারা মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন হওয়ার তিন দিনের মধ্যে আমি দক্ষিণা মেম্বার ও মুকুন্দ মোহন্ত দেশে ফিরে আসি। এসে দেখি আমাদের বাস্তুভিটার চিহ্ন নেই। তখন আমি আমার ভগ্নিপতি চাঁদখানা নিবাসী হরিকেশন রায় জামাই বাবুর বাড়িতে যাই। তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করি। তারা অতি কষ্টে জীবন-যাপন করে খানসেনাদের ভয়ে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করে। ওই সময় আমাদের গ্রামের একদল মুক্তিযোদ্ধা দেশে আসার পথে আমার সঙ্গে দেখা করে। আমাকে বলে গ্রামে যেয়ে সকলের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা অচিরেই সকলে দেশে ফিরে আসছে।

দুই দিন থাকার পরে আবার আমি ভারতে চলে যাই। সরকারি বিধি মোতাবেক আমরা ছাড়পত্র পেলে, পরিবার-পরিজন নিয়ে জন্মভূমি চলে আসি। আমার প্রতিবেশী নওশের আলী সাহেবের সহযোগিতায় থাকার মতো আশ্রয় তৈরি করি। পরে রিলিফ কমিটির মাধ্যমে রেশন অন্যান্য সাহায্য পেতে থাকি। আমি নিজেও রিলিফ

কমিটির সদস্য ছিলাম। বর্তমানে আমার বয়স ৬৭ বছর। আমরা সবকিছু হারিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে নয় মাস ভারতে গাছতলায়, বাঁশতলায়, অনাহারে-অর্ধাহারে জীবন-যাপন করে অনেক প্রিয়জনকে হারিয়ে দেশ স্বাধীন করলাম। আজ আমাদের মূল্য নেই। মুক্তিযোদ্ধারা নানা ষড়যন্ত্রের শিকার। নানাভাবে তারা শোষিত নিপীড়িত।

সূত্র: জ-৪৪৩৩

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **নিরঞ্জন সরকার** | **রুহিনী কান্ত রায়** |
| শরীফাবাদ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | গ্রাম : উত্তর সিংগেরগাড়ী |
| ৯ম শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা | থানা : কিশোরগঞ্জ, জেলা : নীলফামারী |

## পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও দখল করি

আমি সুধীর চন্দ্র রায়। ১৯৭১ সালে কারমাইকেল কলেজের বিএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলাম।

২৬ মার্চে জয় বাংলার ঘোষণা এবং পরের দিন রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাওয়ের কথা শুনে আমরা ছাত্রাবাস থেকে কয়েক বন্ধু আলমনগর যাই। সেখানে দেখতে পাই বহু লোক একজন বিহারি সরফরাজ খানের বাড়ি ঘেরাও করেছে। আমরাও সেখানে অবস্থান নিই। সময় আনুমানিক দুপুর ১২টার দিকে ওই বাড়ি হতে আমাদের লক্ষ করে গুলি ছোড়ে। গুলিতে শংক নামে একটি ছেলে মারা যায় এবং কয়েকজন আহত হয়। ফলে মানুষজন ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং শহরের সমস্ত দোকানপাটে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। শহরে মিলিটারি নামে এবং কারফিউ দেয়। আমি সন্ধ্যায় গ্রামের বাড়ি ফিরে আসি। কয়েকদিন পর ১২ জন যুবক ছেলে নিয়ে ভারতের দিকে রওনা হই। দিনের মধ্যে তিস্তা নদী পার হয়ে সীতাই বন্দরে যাই। সীতাই বন্দর থেকে কুচবিহার রওনা হই। জলপাইগুড়ি ঘুঘুডাঙ্গা ক্যাম্পে ১২ দিন অবস্থান করি। পরে কম্যুনিস্ট নেতা আসাদুজ্জামান নূর ও ওয়ালিউর রহমান মন্টুর সহযোগিতায় আমাদের মুরতি পাহাড়ে নিয়ে যায়। সেখানে ২৯ দিন ট্রেনিং নিই। পরে আমাদের নিয়ে প্রায় ৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করে শামসুল হকের নেতৃত্বে জয় বাংলা স্বাধীনের নিমিত্তে তেতুলিয়া ক্যাম্পে যোগদান করি। সেখানে অবস্থান করে কয়েকদিন পর দলনেতার নির্দেশে রাতে পঞ্চগড় অভিমুখে খানসেনাদের ঘাঁটি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ি ও রাতে ক্যাম্পে ফিরে আসি। এইভাবে ১০-১২ দিন গোলাগুলি চলে। ফলে খানসেনারা পঞ্চগড় ছেড়ে দিয়ে বোদায় ক্যাম্প করে। আমরা তখন পঞ্চগড় দখল করে সেখান থেকে বোদায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যদের ঘাঁটির কাছে রাতারাতি গিয়ে গুলি করে ক্যাম্পে ফিরে আসি। আমাদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে পাকিস্তানিরা বোদা ক্যাম্প ছেড়ে ঠাকুরগাঁওয়ে অবস্থান নেয়, তারপর আমরা বোদায় অবস্থান নিয়ে ঠাকুরগাঁও ক্যাম্পে আক্রমণ চালাই।

ভাদগার পুল ভেঙে দিয়ে খানসেনারা দশ মাইলে অবস্থান নেয়। আমরা তখন ঠাকুরগাঁও ছেড়ে ভাদগা এসে অবস্থান করি। পরে ভাদগার পুল মেরামত করে প্রায় ২২-২৩ শ মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর যোদ্ধা দশ মাইল অভিমুখে অভিযান চালাই। দশ মাইলের খানসেনাদের ঘাঁটি লক্ষ্য করে ৭-৮ দিন

১৬ ডিসেম্বর আমরা যখন রাতে খাবার নিতে যাই তখন ক্যাম্পে ফাঁকা গুলির আওয়াজ হয়। আমরা জানতে পারি গত রাতে খানসেনারা মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আমার দেশ মুক্ত, আমরা স্বাধীন হয়েছি।

আমি, হারাধন মহন্ত ও কমলাকান্ত রায় সকলে মিলে ঠাকুরগাঁও ক্যাম্পে যাই। স্বাধীনের ৭ দিন পরে আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নেয়। অস্ত্র জমা দিয়ে মুক্তিফৌজের পরিচয়পত্র নিয়ে বাড়িতে চলে আসি।

গ্রামের বাড়িতে এসে দেখি ঘরবাড়ির কোনো চিহ্ন নেই, পারেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান নিই। পরিবার-পরিজনকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিই।

জানুয়ারির প্রথম দিকে পরিবার-পরিজনের সাক্ষাৎ পাই, আমার বড় ভাইয়ের এক ছেলে মারা যায়। হারাধনের স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। অন্যদের মা-বাবা ভাই-বোন নানারূপ রোগগ্রস্ত অবস্থায় দেশে ফিরে আসে।

দেশে ফিরে রিলিফ কমিটির সহায়তায় সাহায্য পাই। তার দ্বারা আমরা ঘরবাড়ি তৈরি, চাষাবাদ করে জীবন-যাপন করতে শুরু করি। তখন থেকে হারাধন, কমলাকান্ত, নীলকান্ত সবাই গরিব বলে মাসিক ৫০০ টাকা করে ভাতা পেয়ে যাচ্ছে। আমি পরে বিএসসি পাস করে শিক্ষক হিসাবে স্থানীয় আলাদাতপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে আসছি।

সূত্র: জ-৪৪৩৪

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **লাবণী আক্তার খান** | **সুধীর চন্দ্র রায়** |
| শরীফাবাদ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | গ্রাম : উত্তর সিঙ্গেরগাড়ি |
| দশম শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ | থানা : কিশোরগঞ্জ, জেলা : নীলফামারী |

# মরুভূমি হয়ে আছে চারদিক

সেদিন ১২ এপ্রিল, আমরা সকালে ফজরের নামাজ পড়ার পর কোয়ার্টারের কয়েকজন বন্ধুসহ আলোচনা করছিলাম। আমার স্বামী সবাইকে বলল, আমরা এখন কোথায় যাব, কী করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। আলোচনা করতে করতে দুপুর একটা বেজে গেল। এমন সময় আওয়ামী লীগ অফিস থেকে একটা লোক এসে বলল, কে কোথায় আছেন, সরে পড়েন তাড়াতাড়ি। এখনি হানাদারবাহিনী এসে পড়বে। তখন আমরা ছোটাছুটি করে বাইরে বের হয়ে এলাম পাকশি এমএস কলোনি থেকে। বাইরে বের হয়ে দেখি মরুভূমি হয়ে আছে চারদিক। এ অবস্থা দেখে আমার স্বামীসহ আমি কাঁদতে লাগলাম। তারপর ওই মুহূর্তে সেখানকার খানকা শরিফ নামে এক জায়গা থেকে একজন লোক এসে বলল, তোমরা কাঁদছ কেন? আমরা বললাম, কলোনিতে এখন কেউ নেই আমরা এখন কোথায় যাব, কী করব। লোকটি তখন তার বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেল। যাওয়ার পর দেখতে পেলাম সেখানে আরও কয়েকটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। আমার স্বামী আমাকে সেখানে রেখে এসে সেই খানকা শরিফে ঢুকল আসরের নামাজ পড়ার জন্য। তখনই তিন-চার গাড়ি মিলিটারি এসে হাজির হলো। রাস্তায় ছিল আমাদের কলোনির এক অফিসারের স্ত্রী। তাকে মিলিটারি ধরে ফেলে এবং নির্মমভাবে হত্যা করে। আমি জানালার পাশ থেকে সব কিছু দেখি। আমার স্বামী নামাজরত অবস্থায় ছিল। কারণ সেখানে মিলিটারি ছিল একাধারে তিন দিন। আমার স্বামী তিন দিন সেখানে থাকার পর খানকা শরিফের পেছন দিয়ে আড়াল করে আমার কাছে আসছিল। কিন্তু মিলিটারি তাকে দেখে ফেলে। পেছন থেকে তারা তাকে ধাওয়া করে। দৌড়াতে গিয়ে আমার স্বামী গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তারপর নিজেকে সামলিয়ে একটি ঝোপের মধ্যে নিজেকে আড়াল করে রাখে। মিলিটারি তাকে দেখতে না পেয়ে চলে গেল অন্য পাশ দিয়ে। কিছুক্ষণ পর আমার স্বামী আমার কাছে আসে এবং আমাকে নিয়ে দূর গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিল।

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। একাধারে রাস্তায় চলে গেল তিন দিন। মোট ছয় দিন আমাদের না খেয়ে কেটে গেল। তখন কিন্তু আমি খুব তৃষ্ণার্ত ছিলাম। তাই পদ্মা সারার ঘাটে পানি খাওয়ার জন্য দাঁড়ালাম। সে কী করুণ দৃশ্য! পানির সাথে ভেসে যাচ্ছে মানুষের লাশ। আমি পানি না খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে একটি গ্রামে গিয়ে উঠলাম। সেখানে একটি বাড়িতে অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছে। আমিও সেই বাড়িতে ঢুকলাম ভিখারিণীর মতো। ঢোকার পর সেই বাড়ির লোক আমাকে ঘরে আসতে বলল এবং জিজ্ঞেস করল, কয়েক দিন ধরে কী খেয়েছেন? আমি বললাম, কিছুই খাইনি। তখন লোকটি তার স্ত্রীকে বলল কিছু খেতে দিতে। কিন্তু মহিলাটি রাজি হলো না। লোকটি তখন তার স্ত্রীর ওপর খুব রেগে গেল। তখন এক মুঠো ভাত এনে আমাকে দিল কিন্তু আমি খেলাম না। আমার স্বামী বাইরে না খেয়ে আছে। একটু ঘুমাবার আশ্রয় পেলাম। সেখানে রাত কেটে গেল, ফজর হলো। সেই বাড়িতে যত লোক ছিল সবাই বাইরে এলাম সকাল ১১টার দিকে। সবাই যখন রাস্তায় তখন দুই-তিন গাড়ি মিলিটারি এসে হাজির হলো। সেখান থেকে আমরা কয়েকজন পালিয়ে একটি গর্তের মধ্যে

ঢুকলাম এবং বাকি সব লোককে হানাদারবাহিনী দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলল। সেখানে কয়েক ঘণ্টা থাকার পর সেই গ্রামের মধ্যে ঢুকে প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে নারী-পুরুষ, শিশু, যুবক-যুবতী সবাইকে তারা বের করে নিয়ে আসে। বাড়িগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। নিমিষের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল সবার বাড়িঘর। তারপর স্ত্রী ও যুবতীদের ওপর শুরু করল অমানবিক নির্যাতন। স্ত্রীর চোখের সামনে গুলি করল স্বামীকে। মহিলা ও যুবতীদের ওপর নির্যাতন করার পর ছেড়ে দিয়ে গেল হানাদারেরা। আমরা পাশের জঙ্গল থেকে সবকিছু নিজের চোখে দেখলাম।

আমি এর আগে অনেক লোককে মেরে ফেলতে দেখেছি। তারপরও এখানকার লোকদের দেখে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি।

সূত্র: জ-৪২৫১

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **তছলিমা আক্তারী** | **মনোয়ারা বেগম** |
| কামারপুকুর উচ্চ বিদ্যালয় | গ্রাম : আইসঢাল, পোস্ট : কামারপুকুর |
| দশম শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা, রোল : ০৭ | সৈয়দপুর, নীলফামারী |
| | সম্পর্ক : মা, বয়স : ৬৫ |

## কমান্ডার রওশন আমাদের বাঁচিয়ে দেন

এই গল্পটি আমার বাবার কাছে শোনা। বাবা বললেন, আমরা ছিলাম পাঁচ ভাই আর দুই বোন। তখন আমাদের সংসারের অবস্থা ছিল খুবই ভালো। ছিল গোলা ভরা ধান, ছিল গোয়ালে ১৩টি গরু আর ছিল তিনটি টিনের এবং দুটি খড়ের ঘর। আমার বাবার নাম সমশের দেওয়ান। আর মায়ের নাম খুশিমন বেগম। আমার বড় ভাইয়ের নাম মোংলা। তার ছোট আছির উদ্দিন, তার ছোট হালিম, তার ছোট খালেক এবং সবার ছোট আমি। আমার তিন ভাই বিয়ে করেন। তখন আমার বয়স ছিল ১৩ বছর। আমার মা তখন মারা যান। আমার মা মারা যাওয়ার ঠিক ৩ মাস পর যুদ্ধে শুরু হয়। একদিন আমি হঠাৎ রেডিওতে শুনতে পেলাম শহরে যুদ্ধে শুরু হয়েছে। তখন আমার সেজো ভাই দিনাজপুর হেডকোয়ার্টারে ইপিআর-এর চাকরি করতেন। একদিন বিহারিরা দিনাজপুরে এসে ঘোষণা দেয় বাঙালিরা লাইন হও। কিন্তু আমাদের কমান্ডার টের পান যে আমরা লাইন হলে তারা আমাদের সকলকে গুলি করে হত্যা করবে। তাই বাঙালি ইপিআররা পাল্টা আক্রমণ করে। কিন্তু সেখানে বাঙালিদের হাতিয়ার কম ছিল বলে তারা অনেকে মারা যায় এবং অনেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু আমার ভাই সেখানে ছিল না। কারণ তিনি এবং আরও কয়েকজন মিলে গিয়েছিল কুড়িগ্রামে পোশাক আনতে। তারা এসে শুনতে পায় যে তাদের জায়গা বিহারিরা দখল করেছে। তাই আমার ভাই বাড়ি চলে আসেন।

তখন আমাদের বাড়ি ছিল ডালিয়ায়। আমাদের এই জায়গায় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি। একটি ক্যাম্প ছিল দোয়ানিতে। দোয়ানির ক্যাম্পের কমান্ডার ছিল হারেছ রহমান। আর তার তিন কিলোমিটার দক্ষিণে ছিল রওশনের ক্যাম্প। এরা ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এই জায়গায় এসে আশ্রয় নেন। আর পাকিস্তানি ও বিহারিরা ক্যাম্প তৈরি করে শুটিবাড়ি হাট, নাওতারা এবং সুনামুনির ডাঙায়। হঠাৎ একদিন যুদ্ধের সময় পাঁচজন যোদ্ধা আমাদের বাড়ি এসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু বিহারিরা কেমন করে যেন খবর পেয়ে আমাদের বাড়ি ঘেরাও দেয়। আমার বাবা সেই পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধাকে খবর দেয় যে, অত্যাচারী মিলিটারিরা আমাদের বাড়ি ঘেরাও দিয়েছে। সে সময় আমরা সবাই বড় ঘরে ছিলাম। মুক্তিযোদ্ধারা ছিল গোয়াল ঘরে। তারা মাত্র পাঁচজন ছিল বলে জান বাঁচানোর জন্য আমাদের পেছনের কাউন ক্ষেতের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে নদীর পাড়ে যেয়ে নদীতে লাফ দিয়ে সাঁতরে ওপারে চলে যায়। কিন্তু পিশাচের দল খবর পায় এবং সেখানে ছুটে যায়। এই সময় আমার বাবা আমাদের সকলকে কাউন ক্ষেতে রেখে আসে। তারপর আমার ফুফাতো ভাই নদীর ধারে ঘাস কাটছিল। সে মিলিটারিদের দেখে

নদীতে লাফ দিয়ে নদীর ওপারে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু মিলিটারিরা তাকে মুক্তিযোদ্ধা মনে করে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। সেদিন ছিল বুধবার। আমার ফুফাতো ভাইয়ের নাম ছিল সাদেক আলী। তাকে হত্যা করে খানসেনারা পুনরায় আমাদের বাড়ি ফিরে আসে এবং আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের জায়গা দিই বলে আমাদের ৭টি গরু নিয়ে যায় এবং আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। তারপর তারা আমাদের গ্রামের সকল বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। আমার বাবাকে তারা বন্দুক দিয়ে বুকে বাড়ি দেয়। আমার বাবা সাথে সাথে মাটিতে শুয়ে পড়েন।

তারপর তারা চলে যায় এবং আমরা ক্ষেত থেকে বের হয়ে আসি। আমার বাবাকে ভালো করে তুলি। তারপর যোদ্ধারা পুনরায় আমাদের বাড়ি আসে এবং আমাদের সকলকে নিয়ে যায় উত্তর দিকে। সেখানে একটি বাড়ি ফাঁকা ছিল। সেই বাড়িতে তারা আমাদের থাকতে বলেন। তারা আমার দুই ভাইকে নিয়ে যায় তাদের ক্যাম্পে। তারা ছিল কমান্ডার রওশনের দল। তারপর রাত হলো। সেই রাতে আমরা না খেয়েই ঘুমালাম। পরদিন আমার দুই ভাই দেখি এক হাঁড়ি ভাত এক বালতি ডাল নিয়ে আসে এবং আমরা সবাই তা খাই। খাওয়া-দাওয়ার পর আমার বাবা বড় ভাইকে বলেন, এগুলো কোথায় পেয়েছিস? আমার বড় ভাই বলল, আমরা এগুলো রওশনের ক্যাম্প থেকে নিয়ে এসেছি। তারা এগুলো আমাদের খাওয়ার জন্য দিয়েছে। কারণ আমরা সেখানে কাজ করেছি। আমরা এভাবে ৬-৭ মাস কাটাই। তারপর আমিও রওশনের ক্যাম্পে চলে যাই। আমি তাদের বারুদ, বোমা, গুলি এবং নানা রকম জিনিসপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বরজের ডালির নিচে করে নিয়ে যাই। তারপর একদিন শুরু হলো রওশনের দলের সাথে সুনামুনির ডাঙার বিহারিদের সঙ্গে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারদের অনেকে মারা গেল। আর রওশনের দলের মাত্র দুই জন শহিদ হন এবং চার জন আহত হন।

সূত্র: জ-৪৫৭৮

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **মো. লাবলু মিয়া** | **মো. আ. মালেক মিয়া** |
| ডালিয়া শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় | গ্রাম : ডালিয়া, পোস্ট : ডালিয়া |
| ৭ম শ্রেণি, ক শাখা | থানা : ডিমলা, জেলা : নীলফামারী |

## মাইনটি দৃষ্টিগোচর হয়

আমি গজেন্দ্র নাথ রায়, মুক্তিযোদ্ধা। জলঢাকা উপজেলা কমান্ড সদস্য। বর্তমানে আমি উত্তর বেরুবন্দ বালার পুকুর চৌধুরীহাট স্বপন বাজার রেজি. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি। সেই সময়টা ছিল এপ্রিল মাস। এপ্রিল মাসেই মুক্তিযোদ্ধা যুব শিবিরে ভর্তি হই। সেখানে এক মাসের মতো সাধারণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করায় মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দার্জিলিং জেলার মুজিব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি হই। সেখানে প্রায় ২৮ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে আমি ভারতের হেমকুমারী বেস ক্যাম্প হেডকোয়ার্টারে আসি। সেখান থেকে শুরু হয় আমাদের প্রতিদিনের যুদ্ধের কর্মপরিকল্পনা। সারাদিন বিভিন্ন প্রকার ডিউটি পালন করে সন্ধ্যার সময় আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পর চিলাহাটি খানসেনাদের ক্যাম্পে অতর্কিত হামলা করি। কিছুক্ষণ গোলাগুলির পর আমরা চলে আসি। সারারাত ধরে ঘুমাই। আর এদিকে খানসেনারা সারারাত ধরে মুক্তিযোদ্ধার উদ্দেশ্যে গোলাগুলি চালাতে থাকে। এটাই ছিল আমাদের গেরিলা যুদ্ধ। ইংরেজিতে হিট অ্যান্ড রান। এভাবে কিছুদিন হেমকুমারী বেস ক্যাম্পে যুদ্ধ করার পর হঠাৎ একদিন ভারতে বেস ক্যাপ্টেন আমাদের ৭ জনের একটি গ্রুপকে বাংলাদেশের ভিতরে যাওয়ার জন্য আদেশ করলেন। সেই ক্যাপ্টেন ছিলেন শিখ। নাম সাতোয়াল সিং।

শিখ ক্যাপ্টেনের আদেশক্রমে আমাদের সাতজনের গ্রুপকে বাংলাদেশের রেললাইনে মাইন পুঁততে হবে। এই গ্রুপে আমরা ছিলাম ১. খগেন্দ্রনাথ রায়, গ্রাম পলাশবাড়ি ২. অমূল্য চন্দ্র রায়, গ্রাম ভেণ্ডিপাড়া লক্ষ্মীচাপ ৩. গৌরকিশোর রায়, গ্রাম নিত্যানন্দী ৪. গজেন্দ্র নাথ রায়, গ্রাম বেরুবন্দ এবং বাকি তিন জন ছিল পার্বতীপুর এলাকার লোক। তাদের নাম বর্তমানে মনে পড়ে না। আমরা যখন বাংলাদেশের ভেতরে আসব তখন ক্যাপ্টেন

আমাদেরকে বললেন, তোমাদের যা প্রয়োজন সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে যাও। আমাদের গ্রুপ লিডার বললেন, স্যার আমরা বেশি হাতিয়ার নিয়ে যাব না। মাইন একটি, স্টেনগান ২টি ও হ্যান্ড গ্রেনেড, কিছু অ্যান্টি পার্সনাল মাইন ও পুল নষ্ট করার জন্য এক্সপ্লোসিভ, ডেটেনেটর সেফটি ম্যাচ-এই সমস্তই যথেষ্ট। আমাদের লিডার ক্যাপ্টেনের কাছে কিছু টাকার আবেদন করে বললেন যে, স্যার ভেতরে যাব হয়তো এমন বাড়িতে আশ্রয় নেব যে, সেই লোকটি গরিব, সেখানে অবশ্যই আমাদেরকে নিজের টাকা খরচ করে খেতে হবে। ক্যাপ্টেন আমাদের লিডারের আবেদন মোতাবেক কিছু টাকা দিলেন। আমরা চলে এলাম বাংলাদেশে।

প্রথমে আমরা এলাম লক্ষ্মীচাপ গ্রামের শান্তিরাম রায়ের বাড়িতে। তখন রাত ১২টা। তার বাড়িতে প্রায় তিন দিন অতিবাহিত করি। সেখান থেকে মাইন পোঁতার উদ্দেশ্যে আমাদের পথপ্রদর্শক পলাশবাড়ি গ্রামের এক ভাটিয়ার বাড়িতে যাই। পথপ্রদর্শক ভাটিয়া বলেন, ভাই আমাকে আপনারা মেরে ফেলেন কিন্তু বিস্তারিত ঘটনা আগে শোনেন। তার কাছ থেকে জানা যায়, ইতোপূর্বে আমাদের এক গ্রুপ ভেতরে এসে সেই ভাটিয়ার সহযোগিতায় তরণীবাড়ি রেললাইনে মাইন পুঁতে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে মাইনটি ঠিকমতো ঢেকে দেয়া হয়নি। তাই মাইনটি দৃষ্টিগোচর হয়। সেখানকার এক গরিব লোকের ছেলে তরণীবাড়ি স্টেশনে রাজাকারকে সংবাদ দেয়। সংবাদ পেয়ে রাজাকার বাহিনী সেখানে আসে। মাইন তোলার মতো তাদের কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ না থাকায় তারা সৈয়দপুর পাকসেনাকে সংবাদ দেয়। সংবাদ পাওয়ায় পাকসেনারা সেখানে ছুটে আসে এবং মাইনটি তুলে নেয়। মাইন তোলার পর পাকসেনারা রাজাকার কমান্ডারকে বলেন যে, তুমি কীভাবে এই মাইনটি দেখেছ? কমান্ডার ঘটনা খুলে বলে। পাকসেনারা কমান্ডারকে নির্দেশ দেয় যে, ছেলেটিকে নিয়ে আস। রাজাকার কমান্ডার ছেলেটিকে সেনাদের নিকট নিয়ে আসে। পাকসেনা কমান্ডার ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার বাড়িতে কে আছে? ছেলেটি বলে, যে একমাত্র বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। ছেলেটিকে তাদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে সৈয়দপুরে চলে যায়। সেখানে ছেলেটিকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেয় এবং তাদের গাড়িতে তার মায়ের জন্য এক বস্তা চাল, এক বস্তা আটা, ডাল, তেলসহ ছেলেটিকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

পাকসেনা কমান্ডার ছেলেটিকে বলে, আজ হতে তোমাকে আমি চাকরি দিলাম। তুমি রেললাইন দেখাশোনা করবে। তোমাকে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা বেতন দেব এবং তোমার মায়ের জন্য প্রতি মাসে খাবার পাঠিয়ে দেব। খানসেনা কমান্ডার রাজাকার কমান্ডারকে নির্দেশ দেয় আজ হতে সন্ধ্যার পর তোমরা রেল লাইনে ডিউটি করবে এবং ১৫ মিনিট অন্তর লাইনের ওপর দিয়ে ফাঁকা গুলি ছুড়বে। আবুল ভাটিয়ার কাছে এই ঘটনা শোনার পর আমরা তাকে আর কোনো প্রকার চাপ দিলাম না। কারণ লোকটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে।

আবুল ভাটিয়ার জীবন বাঁচানোর তাগিদে আমরা লাইনে মাইন না পুঁতে রাত ১২:৩০ মিনিটে লক্ষ্মীচাপ ভেগুিপাড়ায় চলে আসি। একটি ছোট রান্নাঘরে নিশিযাপন করার জন্য আশ্রয় নিই। কিন্তু আশ্রয় নেয়ার পর হঠাৎ আমাদের দলনেতা বললেন যে, আগামীকাল যেতে হবে। তাই শান্তিরামের বাড়িতে দুজন লোক যাও। দলনেতার আদেশক্রমে অমূল্য চন্দ্র রায় ও যোগেন্দ্রনাথ রায় সেখানে চলে যান। শান্তিরামকে সম্পূর্ণ ঘটনা জানিয়ে তারা বলেন যে, আমরা কিছু টাকা দিয়ে যাচ্ছি। আপনি আমাদের জন্য চাল কিনে কিছু চাল ভেজে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেবেন। শান্তিরাম চাল ভেজে অতি ভোরে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা ঘুমে বিভোর থাকায় সকাল বেলা জল আনতে না পারায় চাল ভাজা খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হঠাৎ মাথার মধ্যে বুদ্ধি এসে গেল যে আমাদের কাছে তরল দুধ আছে তাই দিয়ে জলের পিপাসা নিবারণ করব। শান্তির দেওয়া পানি পান করার ডেক্সিতে তরল দুধের কৌটা কেটে চাউল ভাজার সাথে মেখে তা খেয়ে সারাদিন সেখানে কাটাই। ইতোমধ্যে বিকাল চারটার মধ্যে এক ঘটনা ঘটে যায়। দুবাছুরী গ্রামের দুই জন ভাটিয়ার ছেলে আমাদেরকে ঘরের মধ্যে দেখে ফেলে এবং তারা আমাদেরকে দেখার পর চলে যেতে শুরু করে।

আমাদের পার্বতীপুরের একজন মুক্তিযোদ্ধা ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলে দুটিকে ধরে ফেলল। ছেলেরা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। আমি ওই মুক্তিযোদ্ধাকে বললাম, ভাই ছেলে দুটিকে ছেড়ে দাও। এই এলাকার সুপরিচিত লোক অমূল্য চন্দ্র রায়কে ছেলে দুটির সাথে ওদের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। ওদের বাবাদেরকে আমাদের বিষয়

সম্পর্কে অবগত করাবেন। তাহলে কোনো রকম সমস্যা হবে না। ছেলে দুইটির সাথে অমূল্য চন্দ্র রায়কে পাঠানো হলো। অমূল্য চন্দ্র ফিরে এসে বললেন, সন্ধ্যা হলে আমরা এখন থেকে সরাসরি ভারতে ফিরে যাব। কারণ আমাদের সামনে দুর্গাপূজা। ওই  সময়টি ছিল আশ্বিন মাসের শেষদিক। সন্ধ্যায় ঘরের বাইরে এসে বসলাম, সকলে পরামর্শ করলাম যে শান্তি রায়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পর ভারতে চলে যাব। পার্বতীপুরের তিনজন ইচ্ছা প্রকাশ করল যে, মার্চ মাস থেকে আজ পর্যন্ত তারা বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে পারিনি। তাই বিশেষ অনুরোধ, তারা বাবা-মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

আমরা সাত জনের মধ্যে চার জন হিন্দু ও তিন জন মুসলমান। পার্বতীপুরের তিন জন ছিল মুসলমান। তাদের কথা শুনে আমরা ওদের অনুমতি দিলাম যে ভাই আপনারা বাবা-মায়ের সাক্ষাৎ করে চলে আসেন। তারা জানালেন যে, সাথে একজন হিন্দু ভাই চলেন। কেউ যেতে রাজি হলো না। তারা বলল, আমরা ভারতে ফিরে গেলে ক্যাপ্টেন সাহেব সন্দেহ করতে পারে। ওদের কথার জবাবে আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো সাথে যেতে। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। কারণ আমাদের এলাকার কেউ ভারতে যায়নি। তাদের করজোড় অনুরোধে আমি যেতে রাজি হলাম।

সন্ধ্যা ৭টার সময় তিন জন ভারতের দিকে রওনা করল ও চার জন আমরা দক্ষিণ দিকে রওনা করলাম। আমরা দুবাচুরী গ্রাম হয়ে আমার এলাকায় এলাম দক্ষিণ বেরুবন্দ গ্রামে। আমাদের চার জনের মধ্যে একজন ক্ষুধায় কাতর হয়ে বললেন যে, গজেন দা যেহেতু আপনার এলাকায় এলাম আপনার জানা মতে এই এলাকার কোনো বাড়িতে ভাত খাওয়া যাবে কিনা। আমি উত্তর দিলাম যে এই এলাকার বিশিষ্ট জনদরদি লোক এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান হাজি মো. নিরাশা প্রামাণিক। তিনি একজন সুপরিচিত লোক তার বাড়িতে গেলে অবশ্যই খেতে পারব। তখন আমরা হাজি সাহেবের বাড়ির দিকে রওনা করলাম। তার বাড়ির পাশে যেতেই হাজি সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে আসছেন। বললাম, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। তারপর সেখান থেকে বামনা বামনি হয়ে কচুকাটা যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে এক বাড়িতে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ দেখতে পাই। তারপর আমরা সেই বাড়িতে প্রবেশ করলাম এবং বললাম যে বাড়িতে কেউ আছেন? তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, যে কাকে চান? আপনারা কারা? আমরা জীবন বাঁচানোর তাগিদে বললাম যে আমরা রাজাকার। কারণ সেখানে আমাদের মিথ্যা বলে তাদেরকে আমাদের আয়ত্তে আনা। তারপর আমরা সেখান থেকে চলে আসি পার্বতীপুরের এক গ্রামে। নাম হলো দিলালপুর। সেই গ্রামে ছিল সেই তিন জন মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি। বাড়িতে তিন দিন অতিবাহিত করার পর আবার আমরা হিলি বর্ডার থেকে রায়গঞ্জ কালিয়াগঞ্জ হয়ে হেমকুমারী ক্যাম্পে আসি। ক্যাম্পে এসে দলনেতা বললেন, এখানে এক মুহূর্তও দেরি করা সম্ভব নয়। তাই আমরা ভাউলাগঞ্জ গোমাইগঞ্জ মানিকগঞ্জ ও ভারত এলাকার ক্যাম্পে মিলিত হয়ে কোম্পানির দলনেতার নেতৃত্বে বাউলাগঞ্জের খানসেনাদের সাথে যুদ্ধ করি দিনের বেলায়। তাদের তাড়িয়ে দিয়ে গোমাইগঞ্জ দখল করে নীলফামারী নটখানায় এসে সবাই একত্রিত হই। তারপর জানতে পারলাম যে, ভারত স্বীকৃতি দিয়েছে। পরে পাকহানাদার বাহিনী আমাদের বাংলাদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সূত্র: জ-৪৫৪৪

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **মো. মমতাজুল আলম** | **গজেন্দ্র নাথ রায়** |
| শিমুলবাড়ী বঙ্গবন্ধু ডিগ্রী কলেজ | মুক্তিযোদ্ধা |
| জলঢাকা, নীলফামারী | জলঢাকা, নীলফামারী |

## ছাত্রনেতা আব্দুর রউফের বাড়ি দাউদাউ করে জ্বলে

নীলফামারী জেলার অন্তর্গত ডোমার উপজেলার ৭নং বোড়াবাড়ী ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড নওদাবস গ্রামটির একাত্তরের কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি। নত্তদাবস গ্রামটির মধ্য দিয়ে একটি বড় রাস্তা গোমনাটি ইউনিয়ন হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। ১৯৭১ সালে ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিলাম। সেই সময়ে আমাদের  গ্রামের রাস্তার ওপর দিয়ে হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছিল। জনতার ঢল দেখে আমরা রাস্তায় এসে

জিজ্ঞেস করি, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? প্রশ্ন করার সাথে সাথে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাউমাউ কান্না করে, তারা বলে, আর এ দেশে থাকা সম্ভব নয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীসহ এ দেশের রাজাকার, আলবদর, আলশামসরা আমাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়।

বেশ কয়েকদিন পর হঠাৎ দেখি পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী সেই সময়ে ছাত্রনেতা আব্দুর রউফের বাড়িতে পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ঠিক সেই দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে এই মুহূর্তে আমাদের চলে যাওয়া উচিত। পরের দিন আমরা বের হওয়ার পূর্বেই আমাদের বাড়ি লুট করার জন্য রাস্তায় অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ে সামসুল হক টগর এমপি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সহায়তায় কোনো রকমে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে রাস্তা থেকে দেখতে পাই যে বাড়িঘর ভাঙাভাঙির কাজ শুরু হয়ে গেছে। অতঃপর রাস্তায় আমাদের আট-দশখানা গরু ও মহিষের গাড়ি যাওয়ার পথে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়। এরপর হঠাৎ আমার দাদার ছাত্ররা শুনতে পেয়ে তারা সদলবলে এসে আমাদের রক্ষা করে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঠাকুমা গলার চেনটা খুলে দিয়ে উপহার হিসেবে সন্তানদের গ্রহণ করতে বলে। কিন্তু তারা তা গ্রহণ না করে আমাদেরকে রাস্তায় পাহারা দিয়ে ভারতে যাওয়ায় সহায়তা করে। এভাবে কোনোমতে ভারতে প্রবেশ করতে পারি। আমার ঠাকুমা খোলা আকাশের নিচে বসে তাদেরকে খাওয়া-দাওয়া করানোর চেষ্টা করে। হঠাৎ সেই সময়ে আমার ঠাকুরদা শোনে কালিগঞ্জ ব্রিজের ওপরে আমার পিসিমাদের ওপর আক্রমণের কথা। সেখানে ছুটে যাই। রাস্তায় শুনতে পাই ব্রিজের ওপর নারী-পুরুষের আলাদা লাইন করে পুরুষদের লাইনে তারা গুলি চালায়। শেষে মা-বোনের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা চালাই। এক কথায় মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী কোনোক্রমেই শেষ করা সম্ভব নয়।

সূত্র: জ-৭৩৮০

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **প্রাণেশ রায়** | **জে. সি বর্মণ** |
| ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | গ্রাম : নওদাবাস, ডাক : বোড়াগাড়ী |
| ৮ম শ্রেণি, ক শাখা | জেলা : নীলফামারী |

## জনপূর্ণ ট্রেনের সকল যাত্রীকে হত্যা করে

১৯৭১ সাল। প্রথম থেকেই দেশের পরিস্থিতি বেশ গরম। মার্চ মাসের শেষের দিকে প্রায় সবখানে মিলিটারি ঢুকে পড়েছে। অকাতরে তারা বাঙালিদের হত্যা করা শুরু করে দিয়েছিল। তাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল আলবদর, আলশামস ও রাজাকার নামে পরিচিত এক শ্রেণির মানুষরূপী হায়েনার দল। তখন আমার দাদু একদিন বাড়িতে এসে বলেছিলেন যে, শোন দেশের অবস্থা ভালো নয়। হয়তো আমাদের দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। তখন আমার বাবা ভারতে পড়াশোনা করত। আমার বাবারা সাত ভাই ও চার বোন। আমার এই কাকুর বয়স তখন ১২-১৩ বছর। দাদুর মুখে সেই কথা শুনে সবাই বেশ অবাক হয়ে গেল। তারপর তারা সবাই মিলে একদিন ঠিক করল যে, সৈয়দপুর থেকে একটি ট্রেন সোজা ভারতে যাবে। অনেক লোক তাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদেরও সবাই ঠিক করল সবাই সেই ট্রেনে চলে যাবে। কিন্তু আমার দাদুর কাছে কোনো প্রকার টাকা-পয়সা না থাকার কারণে দাদুরা সবাই হেঁটে নীলফামারী থেকে সৈয়দপুর রওনা হয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত সেই ট্রেনটি ধরতে পারেনি তারা। অবাক হবেন যে মুক্তির এত বড় সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল আর তাকে আমরা সৌভাগ্য বলছি। কারণ সেই ট্রেন যখন প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে তখন সেই ট্রেনে আগে থেকে লুকিয়ে থাকা রাজাকার, পাকহানাদার বাহিনী ও কিছু বিহারি মিলিয়ে ট্রেনের সকল যাত্রীকে হত্যা করা শুরু করেছিল। ছেলে বুড়ো শিশু মহিলা সবাইকে গুলি ও জবাই করে হত্যা করে মেরে ফেলেছিল। তারপর সেই ট্রেনটিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে তারা। এর মধ্যে থেকে আমাদের এক আত্মীয় জানালা দিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। সেই ফিরে এসে এসব কথা বলেছে। তাঁর বাবা ও মাকে ওই ট্রেনে পুড়িয়ে মেরেছে হায়েনার দল। তারপর আমার কাকুরা সবাই বাড়িতে ফিরে এসে দেখেছিল যে, বাড়ির সব কিছুই লণ্ডভণ্ড। তখন সবাই মিলে পালিয়ে গিয়েছিল গ্রামের দিকে।

বড় বাজারের অদূরে ডালপট্টি নামক স্থানে এক হৃদয়বান ব্যক্তির বাড়িতে সবাই আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কাকুদের সবার পেটে তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা কিন্তু বাবা-মাকে কিছুই বলতে পারছিল না। আমার ছোট চাচু ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তারা সেই বাড়ির মালিকের কাছ থেকে অর্ধবস্তা আতপ চাল ও কিছু সবজি পেয়েছিল। তা দিয়ে দুই দিন সেখানে অবস্থান করেছিল। শহরের পরিস্থিতি আরও খারাপ দেখে আমার দাদু সবাইকে নিয়ে কুন্দুপুকুর নামক গ্রামের এক বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনাহারে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। দাদু এসব দেখে সইতে পারছিলেন না, তিনি কাঁদছিলেন। তারপর দাদু ঠিক করলেন কাকুদের সবাইকে নিয়ে শহরের বাসায় গিয়ে উঠবেন। কপালে যা আছে তাই ঘটবে। অন্তত পথে না খেয়ে মরতে হবে না। তিনি আবার সেই বাসায় ফিরে এসেছিলেন। হয়তো বা তার মৃত্যুই তাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে।

সেখানে চার-পাঁচ দিন থাকার পর ১২ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখের কথা। আমার দাদু যখন দুপুরের ভাত খেতে বসেছেন। ঠিক এমন সময় দাদুর কাজ করত এমন দুইজন রিকশাওয়ালা দাদুকে বাইরে আসতে ডাক দেয়। আমার ঠাকুমা দাদুকে মানা করেছিল খাবারের থালা থেকে উঠে যেতে কিন্তু দাদু শোনেনি। দাদু বলেন যে এরা তো আমারই লোক এরা তো আমার ভালোই চাইবে। এই বলে দাদু তাদের সাথে বাইরে চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পর আমাদের পাশের বাড়ির একজন লোক এসে আমার ঠাকুরমাকে বলল, আপনার ছেলে দুটি কোথায় ওদের ডাকুন, তাদের বাবা ডাকছে। আমার বড় দুই জেঠু কী যেন সন্দেহে খড়ের গাঁদার নিচে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু সেই লোক খুঁজে খুঁজে তাদের বের করে আমার ঠাকুমাকে নানা রকম আশ্বাস দিয়ে তাদের নিয়ে চলে গিয়েছিল। সেই দিন যে কাকুদের পরিবারে কী ঘটেছে তা প্রকাশ করার মতো নয়। সারারাত বাড়ির বড় তিনজন বাড়ি ফিরল না। সবাই কান্নাকাটি করে রাত পাড়ি দিয়েছে। পরের দিন সকালে ওই লোক এসে বলল যে নীলফামারী শহর থেকে ৫ মাইল দূরে টেক্সটাইল নামক এক জায়গায় মিলিটারি ক্যাম্প আছে; সেখানেই নিয়ে গিয়েছে তাদের। পরে লোকের মুখে কাকুরা জানতে পেরেছে টেক্সটাইলের চৌধুরী বাড়ির কিছু দূরে বিশাল এক বাঁশ বাগানে দাদু ও দুই জেঠুসহ আরও অনেককে লাইন করে গুলি করে মেরেছে পাকহানাদাররা। তারপর মাটি খুঁড়ে সেইখানে তাদের পুঁতে ফেলেছে। আজ অবধি সেই বধ্যভূমি সেই রকমই আছে। ওপর থেকে কোনো পদক্ষেপ আসেনি সেই বধ্যভূমি উদঘাটনের। আমার বাবা সেখানে একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছেন। দাদু ও দুই জেঠুর মৃত্যু সংবাদ শুনে ঠাকুমা পুরো পাগলের মতো বিলাপ করতে লেগেছিল। কান্নাকাটিতে বাড়ি একদম নরকে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু যে লোক আমার দুই জেঠুকে বাসা থেকে নিয়ে গিয়েছিল সেই লোকও দুই দিন পর পাকিস্তানি সেনার গুলিতে নিহত হয়েছিল। তারপর আমার ঠাকুরমা মহিলা মানুষ কী করবে না করবে ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাই তারা সেই বাড়িতেই অবস্থান করেছিলেন।

কাকু বলল, সেই দিনে বাসার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মর্টার বন্দুকের গুলির স্ফুলিঙ্গ আজও আমার চোখে ভাসে। হঠাৎ করে সেই বাড়িতে একদিন হানাদার বাহিনী প্রবেশ করে। সবাই তো কান্নাকাটি আর চিৎকার করছিল। কারণ সবাই বুঝতে পেরেছিল যে আজ আমাদের শেষ দিন। সবাইকে লাইন করে দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু ঠাকুমা আমার ছোট কাকুকে কোলে নিয়ে বারবার লাইনের সামনে গিয়ে বুক পেতে দাঁড়াচ্ছিলেন। তিন-চারজন বন্দুকধারী সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। গুলি করার প্রস্তুতি নিতে সবাই চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। এমন সময় হঠাৎ করে একজন মিলিটারি অফিসার এসে বলল এরা মহিলা ও বাচ্চা মানুষ এদের মেরে কোনো লাভ হবে না। আমার ঠাকুমা সেই অফিসারের পা ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন। অফিসার ঠাকুমাকে বলল, আপনাদের কোনো ভয় নেই আপনারা যেতে পারেন। এভাবে অনেক কষ্ট ভয়ভীতি আতংক আর মৃত্যু ভয়ের মধ্য দিয়ে ৯ মাস কেটে যাওয়ার পর দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। সেই দিনে যারা পাকবাহিনীর দোসর রাজাকার বাহিনীতে ছিল আজও তারা উচ্চ আসনে আসীন। কাকুর মুখ থেকে এসব কথা শোনার সময় আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

সূত্র: জ-৪৪৪৬

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **অনুপম ঘোষ** | **দেবাশীষ ঘোষ** |

| | |
|---|---|
| মশিউর রহমান ডিগ্রি কলেজ | ঠিকানা : মাধার মোড় |
| বিএসএস, মানবিক শাখা | ডাক ও জেলা : নীলফামারী |
| রোল : ৬৬ | সম্পর্ক : কাকা |

## এমন করে না পালান বাহে

মেম্বার চাচা যখন বলল, এমন করে না পালান বাহে, মুই থাকতে তারা এই গ্রামে না আসিবে। তখন আমরা তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম। এর মধ্যে প্রায় এক মাস কেটে গেল। পরে যখন শুনলাম যে, হাটের দুই মাইল দূরে খানসেনারা ঘাঁটি গেড়েছে তখন আর সাহস পেলাম না। রাতারাতি বিশ-ত্রিশ মণ ধান চার-পাঁচ টাকা দরে বিক্রি করে দিলাম। পরিস্থিতি এত ভয়াবহ আকার নিয়েছিল যে বাড়িঘর ছেড়ে পরিবার নিয়ে বর্ডারের দিকে পালাতে পালাতেও দু-দুবার পথে লুট হয়ে গেল।

লুটকারীরা যার কাছে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে নিচ্ছে। সাইকেল, সোনার অলংকার, রেডিও এমনকি গরুর গাড়ির গরুগুলোকেও। আমাদের পরিবারটি ছিল যৌথ। আমরাও লুটের শিকার হলাম।

এর মধ্যে আমার বড় বোনের কোলের ছেলেটি কখন যে কোলের মধ্যেই ক্ষিদেই মারা গেছে বিশ্বাস করুন এতটুকু ঠাহর করতে পারিনি। প্রায় দুই দিন না খেয়ে ছিলাম সবাই। এরপর সারা পথটাই কান্না শোক ভয় আতঙ্ক নিয়ে বর্ডার পার হলাম। ভাগ্য ভালো শরণার্থী শিবিরে মাথা গোঁজার জায়গা হয়েছিল। ভাগ্নেকে ওখানেই মাটিচাপা দেয়া হয়েছিল। কয়েকজন যুবকের পিড়াপিড়িতে শেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যুদ্ধে যাব। কিন্তু বাবা ছিল ভীতু টাইপের মানুষ। তিনি যেতে দেবেন না। শেষে একদিন না বলে শিলিগুড়ি ক্যাম্পে গেলাম। নিয়ে গিয়েছিল চেনা-জানা কয়েকজন। আমাদের দেখে কমান্ডার উচ্ছ্বসিত হলেন। কিন্তু আমি ছিলাম ভীষণ রোগাটে আর বেঁটে। কমান্ডার আমাকে দেখে টিটকারি করে বললেন, তোর যে স্বাস্থ্য দেখছো রে বাউ, খান সেনার ডাং ডুং খাইলে তুই তো হাগি ফেলাবু।

পরে জানলাম তিনি আমাদের জেলারই লোক।

সূত্র: জ-৪৪৪৮

| | |
|---|---|
| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
| **উদয় শংকর রায়** | **অমল চন্দ্র রায়, মুক্তিযোদ্ধা** |
| মশিউর রহমান ডিগ্রি কলেজ | ঠিকানা: মাধার মোড়, নীলফামারী |
| বিএসএস ১ম বর্ষ, রোল : ০৫ | সম্পর্ক : কাকা |

## সৈয়দপুরের চেহারা পালটে গিয়েছিল

যুদ্ধ শুরু হয় প্রথমে ঢাকায়। পরে আস্তে আস্তে তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা তখন গ্রামের বাড়িতে। ঘরে ঘরে তখন টেলিভিশন ছিল না। দেশ-বিদেশের খবর জানার জন্য তখন রেডিও ব্যবহার করা হতো। ঢাকা থেকে সৈয়দপুর অনেক দূর বলে প্রথম প্রথম ভয় ছিল না। তবুও গ্রামের মানুষের মনে শান্তি ছিল না। উঠতে-বসতে শুধু যুদ্ধের কথা। আজ চট্টগ্রামে কাল ময়মনসিংহে পরশু রংপুরে এভাবে হানাদারদের নির্মম অত্যাচারের খবর আমাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। গ্রামের অনেকে ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। আসলে অনেক দিন আগের কথা তাই সব মনে নেই। কিছু কিছু মনে আছে। যুদ্ধের জন্য হাটবাজার তেমন বসত না। খাবার দাবারের বেশ অসুবিধা ছিল। বিকেল বেলা খাবারের জন্য একটু বের হলাম। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলাম। রাস্তাঘাটে

তেমন বেশি মানুষ দেখা গেল না। রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। গ্রামে তখন আটটাই অনেক রাত। চোখে ঘুম কিছুতেই আসে না। দুনিয়ার চিন্তা মাথায়। বাচ্চাকাচ্চা আর তোর দাদিকে নিয়ে। তোর বাবা সে সময় সবেমাত্র ক্লাস ফোরে পড়ে। তোর মেজ চাচ্চু টুয়ে পড়ে আর তোর সেজ চাচ্চু ছোট। তাদের নিয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত তখন দুইটা কি তিনটা। গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। সারারাত আর ঘুম কোথায়? সকাল বেলা বের হয়ে দেখি অনেকে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। গ্রামটা একদম শূন্য। একজনের কাছে জানতে চাইলাম, ভাই রাতে কোথায় গোলাগুলি হয়েছে? বলল, সৈয়দপুরের সেনানিবাসের ওই দিক। অনেককে নাকি গুলি করেছে। খবরটা শুনে বাড়ি এলাম। আমিও ভাবলাম বাচ্চাদের এ রকম অবস্থায় রাখা ঠিক নয়। তাই ভেতর গ্রামের আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম।

কিছুদিন পর গাড়িতে গাড়িতে পাকসেনারা গ্রামে আসতে লাগল। গরিব মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। ইচ্ছেমতো যা খুশি তাই করতে লাগল। মনে হচ্ছিল ওই সব যেন ওদের বাপ-দাদার সম্পত্তি। একদিন দুপুর বেলা ১২ জন লোককে হাত-পা বেঁধে মাঠে লাইন করে গুলি করল। এদের মধ্যে এক পরিবারের বাবা বেটা এবং জামাই তিনজনকে ধরে পাশাপাশি দাঁড় করিয়েছিল। তারপর সবাইকে গুলি করল। বাবা খুব চালাক ছিল। পাশের জনকে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে সেও মাটিতে শুয়ে পড়েছিল। পাশের মরা লোকের রক্ত নিজের গায়ে মেখে নিয়েছিল এবং মরার মতো শুয়েছিল। হানাদাররা এসে দেখল কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না। সেই দিন সে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল মৃত্যুর কী যন্ত্রণা ও ভয়।

একদিন সকাল ১০টা কি ১১টা শরিফ মাস্টার নামে একজন লোক সৈয়দপুর শহরে এসেছিল কাজের জন্য। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পাকহানাদার বাহিনী তাকে দেখে ফেলে এবং গুলি করে। এমনভাবে গুলি করেছিল যে, পেটের নাড়িভুঁড়ি সব বের হয়ে গিয়েছিল। তাকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে মাটি দেয়া হয়। গ্রামের দিকে তেমন বেশি কিছু হয়নি। কিন্তু সৈয়দপুর শহরের চেহারা পাল্টে গিয়েছিল। রাস্তাঘাটে বের হওয়া যেত না।

হঠাৎ একদিন বিকেল বেলা আমাদের বাড়িতে এলো চারজন হানাদার সেনা। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। বাবা বৃদ্ধ মানুষ, বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছিল। ওদের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল বাবার। ওরা বিছানার চাদর উঠিয়ে দেখল। দুএকটা টাকা ছিল সেগুলো নিল। দেয়াল ঘড়িটা নিয়ে চলে গেল। বাবাকে কিছু করল না। তার কিছুদিন পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তোর দাদিকে বাড়ি নিয়ে আসি। আস্তে আস্তে সবাই ফিরে আসে নিজ গ্রামে। কি ভয়াবহ ছিল সেই যুদ্ধ। ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তের যুদ্ধ। সেই রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার সেই লাল সূর্যটা। আজ যা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার।

সূত্র: জ-৪৩৭৮

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **সিফাত রহমান সিতি** | **নাজিমুল ইসলাম** |
| সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় | সম্পর্ক : দাদু, বয়স : ৭৫ |
| দশম শ্রেণি, মানবিক শাখা | |

# কালু চৌধুরীর স্ত্রীকে মেলাঘরে পৌঁছে দেই

১৯৬১ সাল থেকে আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলাম। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নোয়াখালীতে বন্যা হয়। জরুরি ভিত্তিতে পাকিস্তান থেকে তিন মাসের ছুটি নিয়ে আসি। এই ছুটিতে থাকাকালীন ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার ভাষণ দেন। তিনি বলেছিলেন, তোমাদের যার যা কিছু আছে তা নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক। তখন আমরা আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে আগারতলা মেলাঘর ২নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারে সবাই একত্রিত হই। তারপর পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে গিয়ে আমরা কমান্ডার নিযুক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনা করি। ফেনীর জয়নাল হাজারীর ভাই খাজুমিয়ার নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করি। সে সময় গুণবতি রেলস্টেশনের পশ্চিম পার্শ্বে নদীর

ওপর ব্রিজ ছিল। ওই ব্রিজে পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। তখন আমরা ওই ব্রিজ ভেঙে দিই। তারপর আমরা সেখান থেকে শ্রমিক নেতা রুহুল আমিনের বাড়িতে যাই। সেখানে তিনি আমাদের আপ্যায়ন করান এবং সাহায্যও করেন। তখন দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গলের সুবেদার লুৎফর রহমান, সুবেদার ওলিউল্লাহ এবং সুবেদার সামসুল হক আমাদের নেতৃত্ব দেন। তখন আমরা জানতে পারি যে, কুমিল্লা স্টেশন থেকে ট্রেনযোগে পাকিস্তানি সৈন্যরা নোয়াখালীর দিকে আসছে। আমরা তখন নাথেরপেটুয়া স্টেশনের নিকট অ্যান্টিট্যাঙ্ক মাইন সেট করে ব্রিজটি ভেঙে ফেলি। তখন তারা ওখানে এসে হেঁটে রওনা দেয়। তখন আমাদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। উক্ত সংঘর্ষে তাদের ৪৮ জন সৈন্য মারা যায়। তারপর আমরা সেখান থেকে চলে যাই। এভাবে আমাদের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। এর মধ্যে আমরা বঙ্গাদিয়া ব্রিজের নিচে মাইন সেট করে একটি পাকিস্তানি গাড়ি ধ্বংস করে দিই। এই খবর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এইভাবে প্রচার করা হয় যে, একটি পাকিস্তানি গাড়ি প্রায় ৭০ ফিট ওপরে উঠেছিল। তখন আমরা আমইস্যা পাড়া গোবিন্দপুর গ্রামের পাল বাড়িতে অবস্থান নিই। সেখানে পাকিস্ত ানিদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয় এবং সিপাহি ওলিউলাহ ঘটনাস্থলে মারা যান। সেখানে থেকে আমরা ৪০০টি রাইফেল উদ্ধার করি। ওলিউলাহকে তার নিজ বাড়িতে দাফন করি।

এরপর সোনাইমুড়ির অপারেশনে হাবিলদার নূর মোহাম্মদ শহিদ হন। তাকে আমরা চন্দ্রগঞ্জ ব্রিজের কাছে দাফন করি। তারপর আমরা নিজ নিজ বাড়িতে চলে যাই। সেখান থেকে আমি বাড়ি পৌঁছেছি গুপ্তচর দ্বারা এই খবর পায় পাকিস্তানিরা। সেখানে আমার খোঁজে গিয়ে আমাকে না পেয়ে তারা আমার বড় ভাইকে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। আমি তখন আগরতলা মেলাঘর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে যাই। সেখান থেকে এক্সপ্লোসিভ ও অ্যান্টিট্যাংক মাইন এসএলআর, এলএমজি, থ্রিনটথ্রি রাইফেল এবং গ্রেনেড নিয়ে আমি আবার ফিরে যাই। তারপর বেগমগঞ্জ থানার পশ্চিমে ফেনাকাটা ব্রিজে পাকিস্তানিদের সাথে সংঘর্ষে তাদের তিনজনের মৃত্যু হয়। হাজীগঞ্জে হাসনাবাদ নামক স্থানে তাদের স্পিড্রবোটে যাওয়ার সময় পানির নিচে মাইন সেট করে তাদের বোট ধ্বংস করে দিই। সেখানে তাদের ৫ জন সৈন্যের মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় তৎকালীন পাকিস্তানের চাটখিল থানার সংসদ সদস্য কালু চৌধুরী আমাকে আগারতলা দুর্গা চৌধুরী পাড়া হতে আবার নোয়াখালীর চাটখিলে পাঠান তার বাড়িতে। সেখানে তার স্ত্রী সন্তানরা ছিলেন। তাদের নিয়ে আসার জন্য তিনি আমাকে দায়িত্ব দেন। আমি তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে চাটখিল গোবিন্দপুর থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। তখন বগাদিয়া ব্রিজের নিকট পাকসৈন্যরা কর্মরত ছিল। আমরা নদীর পাড়ে উঠে খালি নৌকা পাঠিয়ে দিই এবং ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে পানিতে সাঁতার কেটে পার হই। নৌকা তখন ব্রিজের ওই পাড়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা নৌকা দিয়ে গুণবতি পর্যন্ত যাই। সেখান থেকে আমরা হেঁটে লক্ষ্মীপুরের রাস্তা দিয়ে ঢাকার রাস্তা ক্রস করে ভারতে আসি। এসে গাড়িযোগে মেলাঘরে তার স্বামী কালু চৌধুরীর কাছে তাদের পৌঁছে দিই।

সূত্র: জ-৪৩৮৯

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **মো. ফরহাদ হোসেন (পারভেজ)** | **মো. মহরম আলী (বীর মুক্তিযোদ্ধা)** |
| সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় | বয়স : ৭০, সম্পর্ক : নানা |
| ৮ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ৩৮ | |

# চামড়া কেটে লবণ ঢুকিয়ে দিয়েছিল

আমার বাবার কাছে ১৯৭১ সালের আমাদের পরিবারের এক মর্মান্তিক ঘটনা শুনেছিলাম। যেহেতু আমার দাদা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। নানা দিক বিবেচনায় আমাদের পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন বাড়িতে আত্মগোপন করে দিনের পর দিন কাটাত। স্টেশনের পশ্চিম দিকে মোজা নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে সকলে মিলে থাকা শুরু করেছিল। বেশ কয়েকদিন সেখানে

থাকল। হঠাৎ একদিন মোজাদা বলেছিল, শান্তি কমিটির জনৈক যুগ্ম সম্পাদকের সঙ্গে তার কথা হয়েছে এই মর্মে যে, 'পাকবাহিনী এখন থেকে আর কাউকে ধরবে না' এ কথার ওপর বিশ্বাস করে পরিবারের সকল সদস্য নিজ বাড়িতে চলে এলো সকাল বেলা। কিন্তু সকলের মনে ভয় থেকেই গেল। এই ভয় নিয়ে সকলেই চুপচাপ ছিল। বিকেল তিনটার দিকে হঠাৎ শুনতে পায় গাড়ির শব্দ। জানালা খুলে বাবা দেখে সম্পূর্ণ বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে পাকবাহিনী। পালানোর কোনো উপায় ছিল না। অতঃপর আমাদের পরিবারের সদস্যদের বন্দি করে সিও অফিসে অবস্থিত পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে গেল। আমার বাবার ছোট ভাই-বোন, মা এবং প্রতিবেশী বজলার রহমান বজুর মাকে ক্যাম্পে বন্দি করা হয়েছিল। বেলা গড়িয়ে মাগরিবের সময় হয়েছিল। দাদিরা নামাজ পড়বে। তবে ওজু করার জন্য পানির ব্যবস্থা ছিল না। তারা লক্ষ করছিল পাকবাহিনীর প্রিয়ভাজন ব্যক্তি সুলতান বিহারির দিকে। তাকে ওজুর পানির কথা বলতে সে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল। শেষে দাদিরা তায়াম্মুম সেরে নামাজ আদায় করেছিল।

ক্যাপ্টেন জাবেদ বাবারা বন্দি থাকাকালীন বাইরে ছিল। তারপর সে কিছুক্ষণ পর এসেছিল। ছিলেন রাগী, দুশ্চরিত্র ও নরপিশাচ। সে আসায় সকলে ভয়ে কম্পমান। বাবারা ভেবেছিল আমরা মরে যাওয়ার কাছে দাঁড়িয়েছি। সন্ধ্যার শুরুতে দুজন পাক আর্মি বাবাদের কাছে এসেছিল এবং বাবাদের নিয়ে যায় ক্যাপ্টেন জাবেদের নিকট। সে এক ভয়ানক দৃশ্য। ক্যাপ্টেন জাবেদ তাকাচ্ছিল কড়া দৃষ্টিতে। একপর্যায় আমার বাবা আনজারুল হক এবং আমার চাচা আকতারুল হক আকু এদের বাছাই করে ক্যাম্পে রেখে বাকি সবাইকে ছেড়ে দিয়েছিল। ক্যাম্পের বারান্দায় বাবা ও চাচাকে জিজ্ঞাসা করেছিল "আপকা ফাদার কেধার হ্যায়" বাবা সত্য কথা বলেছিল। ইন্ডিয়া ম্যা হ্যায়। উনি বাবার কথায় রেগে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর বাবা ও চাচা বন্দিকৃত মোশারফ হোসেন, মহিজ উদ্দিন ও পিয়ন সফি মিঞাকে জিজ্ঞাসা শুরু করেছিল। আর বাবা ও চাচাদের এক থালা খাবার এনে দিয়েছিল। কিন্তু তারা ভয়ে অস্থির। সে অবস্থায় খাওয়া সম্ভব নয়। একটা দানাও তারা খেতে পারল না। ক্যাপ্টেন জাবেদ, মোশারফ হোসেন, মহিজ উদ্দিন ও পিয়ন সফি এদের ওপর অত্যাচার করছিল। আর তারা চিৎকার করেছিল। কী যে মর্মান্তিক ঘটনা, তা বলে ও লিখে বোঝানো অসম্ভব।

রাত নয়টার দিকে বাবা ও চাচাসহ মোশারফ হোসেনদের বন্দি করে একটি ঘরে রেখেছিল। এখানে পূর্ব থেকেই বন্দি ছিল রহমান নামে একজন ডিমলা থানার ব্যক্তি। রাত খুব গভীর হয়েছিল। কারো ঘুম ছিল না। সকলের মনে ছিল একটি ভয় যে, কখন পাক আর্মিরা গুলি করে। রাতে গাড়ির শব্দ শুনতে পেয়েই বাবা পড়েছিল ভীষণ চিন্তায়। বাবা ভাবছিল আর্মিরা এখান থেকে পালিয়ে গেল। দেশ কি স্বাধীন হতে চলেছে ইত্যাদি।

এভাবে নানা দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠায় রাত কেটে গিয়েছিল। তারপর যে কী হবে? সকাল ১০টা। এ রকম সময়ে একটি গাড়ির শব্দ শুনতে পেল। কিছুক্ষণ পর ডোমার থানার ওসি ঘরের তালা খুলে বললো, নতুন গ্রুপ পাক আর্মি এসেছে। পুরাতন গ্রুপ অর্থাৎ জাবেদের গ্রুপ বদলি হয়েছে। নতুন আর্মিদের কাছে বন্দিদের বুঝিয়ে দিয়ে বন্দি ঘরের তালা বন্ধ করে দিয়েছিল। রহমান যখন বলেছিল আব্দুল বারীকে যেভাবে অত্যাচার করেছিল, তা শুনলে বাকিদের দেহের লোম শিউরে উঠত। একজন জীবন্ত মানুষের গায়ের চামড়া কেটে লবণ ঢুকিয়ে দিয়েছিল পাকবাহিনী। এসব কথা বলত রহমান কাঁদো কাঁদো ভাব নিয়ে, আব্দুল বারীর আর্তনাদ গোটা ক্যাম্পের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। রক্তমাখা শরীরে লুটিয়ে পড়া বারীকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এই নির্মমতার কথা শুনে কষ্টে বুকের পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্ছিল। রাত হলে সকলেই ভাবছে সকাল হলেই আব্দুল বারীকে অত্যাচার করে মেরে ফেলবে।

সকাল হলো তখন ৮টার সময় সৈয়দপুরের এক বিহারি ছেলে বন্দিদের হাত মুখ ধুয়ে বাথরুম সারার কথা জানিয়ে গিয়েছিল। প্রথম দেখায় বাবা ছেলেটিকে চিনতে পেরেছিল। সে একজন স্কাউট ছিল। অল পাকিস্তান জাম্বুরিতে তার সাথে বাবার পরিচয় হয়েছিল। ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে আমার বাবা উক্ত জাম্বুরিতে অংশগ্রহণ করেছিল। ছেলেটি বাবাকে 'এখানে কেন' বললে বাবা বলেছিল দাদার কথা যে, তিনি আওয়ামী লীগ সভাপতি তাই আমাদের বন্দি করেছে। ছেলেটি বাবা ও চাচাকে সুদৃষ্টিতে দেখে। চাচা ও বাবাকে সে আর্মির

চেয়ারে বসিয়ে খাওয়ায়। বিকেল তিনটার কিছুক্ষণ পরেই মঞ্জুর মিঞা চিন্তা না করার কথা বলে। সে আরও বলে ব্যবস্থা হচ্ছে। সুবেদার বন্দি রুমে এসেছিল। এবং কাকে কী কারণে বন্দি করা হয়েছিল তা জলদি শুনতে চায়। মোশারফ মিঞাকে হিন্দু বলে তাকে চড় মেরেছিল। কিছুক্ষণ পর বিহারি ছেলেটি এসে বাবাকে সুবেদারের কাছে নিয়ে যায়। সে শুনতে চায় কী হয়েছিল? অতঃপর সে বলে ক্যাপ্টেন আল্লা রাখা খানের সাথে কথা বলে দেখি। স্কাউট ছেলেটি পরের দিন বিকালে এক এক করে বন্দিদের ডাকে ও চড় মারে এবং প্রহার করা হয় লাঠি দিয়ে। প্রহারের একপর্যায়ে ক্যাপ্টেনের আঙুল কাটা যায়। ফলে কিছুক্ষণ প্রহার বন্ধ থাকে। তারপর যথাক্রমে ডাক পড়ে মোশারফ মিঞার। তাকে প্রহার করেছিল লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড জোরে। তার চিৎকারে গোটা ক্যাম্প কাঁপছিল। তারপর ডাক পড়ল চাচা ও বাবার। ভয়ে ভয়ে সামনে দাঁড়াল বাবা ও চাচা। ক্যাপ্টেন বলল বাবাকে– আপকা ফাদার ইন্ডিয়া ম্যা হ্যায়। বাবা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। ক্যাপ্টেন বলল দুই ভাইয়ের একজনকে মেরে ফেলবে ও অপরকে ছেড়ে দেবে। চাচা বলল, বড় ভাইকে ছেড়ে দাও, আমাকে মেরে ফেল। ছোট ভাইয়ের মুখে একথা শুনে বাবার চোখে পানি চলে আসে। বাবা অশ্রুসিক্ত হয়ে বলল, না। ছোট ভাইকে ছেড়ে দাও আমাকে মারো। ক্যাপ্টেন এসব দেখে বলেছিল, তোমাদের দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারপর আবার স্কাউটের ছেলেটি বাবা ও চাচা বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল এবং বলেছিল কোনো চিন্তা নেই। তোমাদের যে ছেড়ে দেয়া হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সন্ধ্যা হয়েছিল। মোশারফ মিঞা লাঠির আঘাতে আমতা আমতা করে বলেছিল পুলিশের চাকরি বলে আমি পেরেছি সহ্য করতে। রাতে স্কাউট ছেলেটি বাবাকে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যায়। সে বাবাকে খেতে দিতে বলেছিল। এ সময় কে একজন এসে ক্যাপ্টেনকে একটি লিস্ট দিল। বাবা জানে না কিসের এই লিস্ট। কানে কানে সেই ব্যক্তি কী যেন বলেছিল। এ নিয়ে বাবা আবার চিন্তায় পড়ল। সে বললো, দাদাকে এনে দিলে তবে তাদের ছাড়বে। কিন্তু বাবা বলল, নানা ভারতে, কিন্তু ভারতে কোথায় তা জানি না। সকালে বাবা ও চাচাকে ছেড়ে দেবে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, তাড়াতাড়ি এই কথা বলল ক্যাপ্টেন। বাবা ভাবছে কাল সকালে সূর্যমুখ দেখতে পাই কি না। পরদিন সকালে স্কাউটের ছেলেটি বলল, তোমরা দুই ভাই ক্যাপ্টেন সাহেবের সাথে দেখা করে আস। বাবা ও চাচা ভয়ে ভয়ে ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করেছিল। ক্যাপ্টেন বলল শান্তভাবে 'হ্যাঁ। তোমাদের ছেড়ে দেব। যাও তোমরা এখন।' দুই ভাই মুক্তি পেয়ে ছুটতে থাকে বাড়ির দিকে।

সূত্র: জ-১৩৬০১

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **আশরাফুল হক** | **আনজারুর হক** |
| ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | গ্রাম : চিকনমাটি, ডোমার, নীলফামারী |
| ৮ম শ্রেণি | বয়স : ৫০ বছর, সম্পর্ক : বাবা |

## সৈয়দপুর দখলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়

চার থেকে সাত এপ্রিল পাকহানাদার বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি সৈয়দপুর সেনানিবাস আক্রমণে ডোমারের মুক্তিকামী ছেলেরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। তৎকালীন জিন্নাহ মেমোরিয়াল হল বর্তমান শহিদ ধীরাজমিজান স্মৃতি পাঠাগার থেকে সবাই একত্রিত হয়ে সৈয়দপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। এ পাঠাগারটি ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনসহ সব আন্দোলনের সূতিকাগার ছিল। পাকবাহিনীর শক্তিশালী অস্ত্রের মুখে আন্দোলন করে টিকতে না পেরে পালিয়ে এসে ডোমারের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে যায় যুবকরা। পরে ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সম্ভবত ১০ এপ্রিল পাকহানাদার বাহিনী সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ডোমারে আসে। বিহারিরা পাকসৈন্যদের সহযোগিতা করেছিল। এসে প্রথমে আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত এমএনএ আব্দুর রউফের বাসায় আগুন লাগিয়ে দেয় ও পথে অনেক মানুষকে তারা মেরেছিল। তারপর ডোমার তৎকালীন সিও অফিসে বর্তমান উপজেলা কার্যালয়ে ক্যাম্প করে। সিও অফিসের পাশে বন বিভাগের অফিসে বিরাট বাংকার করে নদীর এপারে শক্তিশালীভাবে অবস্থান নেয়। সিও অফিসের হলুদ বিল্ডিংটি ছিল পাকহানাদার বাহিনীর টর্চার

সেল। এখানে মুক্তিকামী মানুষ ও যাদের পরিবারে ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল তাদের পরিবারের লোকজনকে ও যে সব মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়ত তাদের নির্মমভাবে অত্যাচার করত এবং মেরে ফেলত। বন বিভাগের নদীর ধারে গণকবর করে সেখানে ফেলে রাখত। ডোমারে রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সহযোগিতায় পাকবাহিনী ডোমার ও আশপাশের যুবতী মেয়েদের এনে মনোরঞ্জন করে মেরে ফেলত। ডোমারের পাকবাহিনীর সহযোগী ছিল হাবিব খান, সুলতান বিহারি, খলিল বিহারি ও মুসলিম লীগের লোকেরা।

পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারীদের মধ্যে প্রধান ছিল পাগলা মেজর আলী আখতার, মেয়ে লোভী নরপিশাচ ক্যাপ্টেন জাবেদ, আলারাখা খানসহ অন্যরা। পাকবাহিনীর প্রধান লক্ষ্য ছিল ডোমারের আওয়ামী লীগ, প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও হিন্দু পরিবারের লোকেদের হত্যা করা। ডোমারে আর্মি আসার পূর্বের দিন পাড়ার সকল হিন্দু পরিবার হেঁটে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। যারা ভারতে যেতে পারেনি সেই সকল লোক ও পরিবার প্রতিমুহূর্তে নিজেরা ও নারীদের রক্ষার ভয়ে আতঙ্কিত দিন কাটিয়েছিলেন। পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে ফেলায় ছেলে রঞ্জুর অপরাধে সাহাপাড়া মোশারফ হোসেনকে পাকবাহিনীর টর্চার সেলে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে অত্যাচার করে ও লাথি মারে। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অত্যাচারে তার চিৎকার নাকি অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যেত। সৈয়দপুর আক্রমণের সহযোগিতার জন্য চিকনমাটির শহিদ আব্দুল বারীকে টর্চার সেলে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে অত্যাচার করেছিল। গায়ের চামড়া কেটে হলুদ মেখে দিত ও পরে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, গুলি করে মেরে বন বিভাগের গণকবরে রেখেছিল।

বসতপাড়ার রশিদুল হক চিকনমাটির আবুল কাশেম, ওসি, এলএসডি মফিজ উদ্দিন ও তার পিয়ন সফি মিয়াকে ক্যাম্পে কয়েক দিন রেখে অত্যাচার করে ছেড়ে দিয়েছিল। ডোমার থানার আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি লুৎফুল হক ভারতে যাওয়ার অপরাধে তার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ নেতা বজলার রহমানের বৃদ্ধ মাকেও আর্মিরা রাজাকারদের সহযোগিতায় ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিল। পরে লুৎফুল হকের দুই ছেলেকে রেখে বাকিদের ছেড়ে দিয়েছিল। লুৎফুল হকের দুই ছেলেকে কয়েকদিন পরে ছেড়ে দিয়েছিল।

হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক হওয়ার জন্য এ দেশীয় রাজাকার আলবদরদের সহযোগীরা ডোমারের বারিন কুণ্ডু ও গৌর কুণ্ডুকে ডোমার থানায় নির্যাতন করে গুলি করে মেরেছিল। এভাবে প্রতিনিয়ত রাজাকার-আলবদর বাহিনীর সহযোগিতায় নরপিশাচ হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ডোমার থানার নাম না জানা অগণিত মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিকামী মানুষ হত্যা, নারী ধর্ষণ করেছিল। যা বিশ্বের মানব ইতিহাসে বিরল। এরা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র হিসাবে চিরদিন বিবেচিত হবে।

সূত্র: জ-১৩৬২৯

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **সুস্ময় সাহা** | **বিকাশ সাহা** |
| ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | বয়স : ৬০ বছর, সম্পর্ক : পিতা |
| ৭ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ১০ | |

# ইন্দিরা গান্ধী হলদিবাড়ি আসেন

ডোমার থেকে জনগণ নিজের বাড়িঘর ত্যাগ করে পাকবাহিনীর ভয়ে ভারতে পাড়ি দেয় বিশেষ করে হিন্দুরা। যারা কয়েকজন ছিল তাদের অবস্থা করুণ হয়েছিল। ডোমার প্রায় খালি হয়ে গেল। ভারতে মুক্তিবাহিনী গঠিত হলো এবং সেখানে ট্রেনিং নিয়ে ডোমার ডিমলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের সাথে মানুষের পরিচয় হতো কিন্তু তারা যে মুক্তিবাহিনী পরিচয় দিত না। তারা যুবক হওয়ায় তাদের অনেক সমস্যা হতো। তাদের অনেককে জীবন হারাতে হয় এবং পালিয়েও যেতে হয়। ডোমারে অনেকে পালাতে পারলেও তিনি তার পরিবারের সদস্যদের সরাতে পারলেন না। তারপর মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যদিকে পাকবাহিনীর অনবরত গোলাগুলিতে

প্রাণ বাঁচানোর জন্য তারা মাটির নিচে বাংকার করেন । শেষ পর্যন্ত তার মায়ের দৃঢ় মনোবল ছিল আল্লাহর ওপর যে তারা মরলে এখানে মরবেন বাঁচলে এখানে বাঁচবেন। পরিবারের সকলেই একমত ছিলেন। তিনি হেল্থ ডিপার্টমেন্টের স্বাস্থ্য সহকারী ছিলেন। তার পুত্র মো. নজরুল ইসলাম বিএসসি পাস করে মির্জাগঞ্জ হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

এদিকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার জন্য পাকিস্তানি বাহিনী বেশি করে বাংলাদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালায়। তখন পাকিস্তানি বাহিনী যুবকদের মুক্তিযোদ্ধা ভেবে মেরে ফেলত। বাধ্য হয়ে তার ছেলেকে বর্ডার পার করে দেয়ার জন্য ডিমলা দিয়ে ঠাকুরগঞ্জে গেলেন। সেখান থেকে তাকে পার করার জন্য সীমান্তের তারামুদ্দিন নামে একজনের বাড়িতে রাত্রিযাপন করলেন। ভোরবেলা উঠে নাস্তা খেয়ে বর্ডার পার হওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। সেই দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হলদিবাড়ি আসেন শরণার্থীদের দেখার জন্য। ফলে সীমান্ত এলাকাটা খুব কড়া পাহারা ছিল। কোনো লোক সেদিন এপার থেকে ওপারে যেতে পারেনি। ফলে তিনিও পারেননি।

পরদিন তিনি আবার তার কর্মস্থলে গেলেন। তারপর ২৬ নভেম্বর নিয়মিত অফিস করে বাসায় ফিরলেন। পরদিন ভোরবেলা নাস্তা খেয়ে ডিমলা যাওয়ার উদ্দেশ্যে হেলথ ব্যাগ নিয়ে দরজার বাইরে এক পা দিয়েছেন এমন সময় অফিস পিয়ন মোজাহার হোসেন সাইকেলে করে এসে সাইকেল রেখে বাইরে বের হওয়ার অবস্থা দেখে বললেন, আপনাকে মেজর ডাকছে। সে খুব কাঁপছিল। তিনি সাথে সাথে তাকে ঘরে ঢুকালেন এবং বসতে দিলেন। তারপর তিনি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে বল? তারপর সে বলল, গতকাল আপনি আসার পর ক্যাপ্টেন সাহেব অফিসে গিয়ে খুঁজছিল। পিয়ন তাকে বলেছিল, বাসায় গেছে। ক্যাপ্টেন সাহেব তাকে সাথে নিয়ে রেভিনিউ সার্কেল অফিসে গিয়েছিল। সে সময় রেভিনিউ সার্কেল অফিসার সিওর দায়িত্ব পালন করছিল। সেই সময় খলিলুর রহমান ও রেভিনিউ সার্কেল অফিসে কোনো স্টাফ ছিল না। সকলে পালিয়ে গিয়েছিল। রেভিনিউ সাহেব বলেছে, আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তাদের ক্যাম্পে রেকর্ডপত্রসহ হাজির হওয়ার জন্য মেজর সাহেব ডেকেছে। অন্যথায় তারা এখানে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত করবে। সে তখন ভয়ে কাঁপছিল। নাস্তা করে তারা তাড়াতাড়ি অফিসে এসে কাগজপত্র নিয়ে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে গেলেন। পাকবাহিনী সেখানকার একটা প্রাইমারি স্কুলে ক্যাম্প করেছে, সেখানে গিয়ে তিনি তার এক পূর্বপরিচিত দুলাল চেয়ারম্যানকে দেখতে পান। তিনি বলেন, আপনি এখানে কী করছেন? মেজর ডাকছে তাই এসেছি বলেন তিনি। তারপর দুলাল চেয়ারম্যানকে মেজর সাহেব ডেকে পাঠায় এবং এক ঘণ্টা পর তারা দুজনে এক সাথে বের হয়ে আসে। তিনি দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। মেজর সাহেব আসার সাথে সাথে তিনি সালাম দিলেন। দুলাল চৌধুরী চলে গেলেন। মেজর সাহেব বললেন আপ কন হে? তিনি বললেন ম্যা স্যানেটারি ইনচার্জ। তারা উভয়েই রেস্ট হাউসে ঢুকলেন। সে চেয়ারে না বসে টেবিলের ওপর এক পা উঠিয়ে দিয়ে কথাবার্তা বলতেছিল। আমাকে বলল যে, ক্যাছা হে? আচ্ছা হে? স্টাফ কাহা। আমার ফিল্ড মে হে কেয়া কাম করনে কে গিয়া। হাম এপিডেমিক কাম করনে কে গিয়া। তখন সে রাগ হয়ে বললো, বাঙ্গালকো কাম করনে কে গিয়া। অনেক কথা কাটাকাটি হলো। শেষে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম, স্যার স্টাফকো ওষুধ এর কাজ করনে কে লিয়ে। তখন মেজর বলল, মুক্তিফৌজকে ওর জয়বাংলাকো কাজ করনে লিয়ে এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, আপ সব নেমক হারাম হ্যায়। তখন তিনি বহুক্ষণ চুপ করে থাকার পর চিন্তা করলেন যে সমস্ত চার্জ করতে ছিলেন প্রত্যেকটি চার্জে তার গুলি ছাড়া কোনো উপায় নেই। তখন তিনি চিন্তা-ভাবনা করলেন যে তার মৃত্যু নিশ্চিত। তারপর আলাহর ওপর সব ছেড়ে দিলেন। কিন্তু পরে তার কোনো ক্ষতি হলো না।

সূত্র: জ-১৩৬৪৮

| সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী |
|---|---|
| **ওয়াহেদ রফিক আকাশ** | **খলিলুর রহমান** |
| ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | বয়স : ৯০ বছর |
| ৭ম শ্রেণি | |